কাওরা সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র

পরিচিতি

সাতক্ষীরা জেলায় কাওরা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ২৫০০। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার ৫%, তারপরও তাদের লেখাপড়া ৫ম শ্রেণীর উপরে নয়। এদের মধ্যে কেউই এস.এস.সি. পাশ করেনি। কায়পুত্র = কাওরা। তাদের দাবি ব্রাহ্মণ ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের সাথে তাদের ধর্মীয় মিল আছে, আর এ কারণে এক সময়ে তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াসহ বিবাহ কার্য পর্যন্ত চলত, কিন্তু বর্তমানে কালের বিবর্তনে তারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের পুরনো সৌন্দর্য। এখন সকলে তাদের 'কাওরা' বলে ডাকে। কায়পুত্র নামটি তাদের কাছে বেশ সম্মানের। এ কারণে কাওরা নামের পরিবর্তে তারা কায়পুত্র নামটাই তাদের জন্য উপযুক্ত মনে করে।

কাওরা নামের উৎপত্তি

হিন্দু ধর্মের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর এক গোত্রের নাম কায়পুত্র। কাজের প্রয়োজনে এই গোত্রের কিছু মানুষ শূকর পালন শুরু করে। শূকর নিয়ে তারা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমায়। এ সময় অন্যত্র গিয়ে মানুষের দ্বারা তারা লাঞ্ছিত হতে থাকে। এভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকলে, এক সময় অন্যান্য মানুষদের কাছে তারা কাওরা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এ কারণে তাদের সমগোত্রীয় ব্রাহ্মণরা তাদের থেকে নিজেদের আলাদা করে ফেলে। মূলত এইভাবে তারা কাওরা নামের এক আলাদা গোত্রে পরিণত হয়।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত কাওরা সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ আদিমকাল হতে সাতক্ষীরায় বসবাস করে আসছে। তারা যখন বাংলাদেশে বসবাস শুরু করে, তখন চারদিক জঙ্গলে ভরা। বন কেটে প্রথমে তারা বসতি স্থাপন করে। এক সময় তারা অনেক জমিজমার মালিক ছিল। তখন তাদের সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছিল না। আর এই শিক্ষার অভাবে তাদের ঘরবাড়ি, জমি-জায়গা সবই অন্যের হস্তগত হয়। বিশেষ করে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের সময় তারা সকলে একসাথে ভারতে পাড়ি জমায়। এই সুযোগে স্থানীয় বিত্তশালীরা বিভিন্ন উপায়ে তাদের জমিজায়গা নিজেদের নামে লিখে নেয়। একদিকে সংখ্যালঘু পরিচয় আর অপরদিকে শিক্ষার অভাব ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে তাদের পক্ষে পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই তারা বাধ্য হয় রাস্তার পারে সরকারী খাস জমিতে বসবাস করতে। বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে দু:সহ জীবন কাটাতে হচ্ছে বর্তমান কাওরা সম্প্রদায়ের মানুষদের।

জীবন-জীবিকা

কাওরা সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ শূকর পালন করে থাকে। সাতক্ষীরার অধিকাংশ কাওরা অন্যের শূকরের পালে বেতন চুক্তিতে কাজ করে। শুকরের পালে থাকার দরুণ তাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করতে হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, পটুয়াখালী, যশোর, নড়াইল, পিরোজপুর, মাগুরা ইত্যাদি। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানুষগুলো বৎসরে এক বা দুইবার বাড়িতে আসার সুযোগ পায়। এত কষ্টের বিনিময়ে বেতন হিসেবে তারা পায় বৎসরে ৮-১০ হাজার টাকা। এই টাকা দিয়ে সংসার চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর তাই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো তাদের কাছে দুঃস্বপ্ন। মহাজনের পালে অনেক সময় মড়ক লেগে অনেক শুকর মারা যায়। এতে মহাজনের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়। এ কারণে মাঝে-মাঝে তারা বাৎসরিক মজুরীও পায় না, ফলে তাদের এক দুর্বিসহ জীবন যাপন করতে হয়। এ সময় সংসারের অন্যদের ভিক্ষার মত জঘন্য কাজও করতে

হয়। এছাড়া এদের মধ্যে কেউ কেউ বর্তমানে ভ্যান চালায়, অন্যের জমিতে মজুরী খাটে, মাছের ব্যবসা করে, ভিক্ষা করে বেড়ায়।

লেখাপড়া

কাওরা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার শূন্যের কোঠায়। ইতিপূর্বে তাদের কেউ শিক্ষার সুযোগ পায়নি। এ কারণে তাদের মধ্যে অশিক্ষা ও কুসংস্কার বিদ্যমান। এই অশিক্ষা ও কুসংস্কার থেকে তাদের পক্ষে বেরিয়ে আসা অনেক কঠিন। তাই এগুলি নিয়েই এদের জীবন।

চিকিৎসা

অধিকাংশ মানুষ আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তারা সাধারণত স্থানীয় কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করিয়ে থাকে। তাছাড়া, বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তারা পূজাও দিয়ে থাকে। ডাক্তারের কাছে তারা খুব কমই যায়, কেননা ডাক্তারের কাছে গেলে অনেক টাকা লাগবে। স্বাস্থ্যসেবা বলতে যা বোঝায় তার বিন্দুমাত্র এ সব মানুষ পায় না।

বাসস্থান

সরকারী খাস জমিতে তাদের বসবাস। অল্প কিছু মানুষের নিজস্ব জমিজমা আছে। তাদের ঘরগুলো চাচ, বাঁশের কঞ্চি ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। অনেকের মাটির ঘরে ছাউনি পর্যন্ত নেই। রোদ বৃষ্টির মধ্যে তারা কোন রকম দিনযাপন করে। তাদের এই দুর্বিসহ জীবন আধুনিক যুগে খুবই বেমানান দেখায়।

বিবাহ

কাওরাদের মধ্যে বিবাহ সাধারণত নিজেদের মধ্যেই হয়ে থাকে। অতীতে ব্রাহ্মণ ও নমশূদ্র গোত্রের মানুষের সঙ্গে তাদের বিবাহ হত। কিন্তু বর্তমানে ব্রাহ্মণদের সাথে তাদের আর বিবাহ হয় না। তবে এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে নমশূদ্র গোত্রের সাথে তাদের বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুশীলন

কাওরা সম্প্রদায় সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। তারা সচরাচর এই ধর্মের সকল পূজা-পার্বণে অংশগ্রহণ করে। তাদের বিশেষ কোন ধর্মীয় ব্যবস্থা নেই।

তাদের মধ্যে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলে তারা অনেক আনন্দ-উৎসব করে। জন্মের ২১ দিনের মাথায় তারা ষষ্ঠী পূজা করে। এদিন গ্রামের সকলে মিলে শিশুর মঙ্গল কামনা করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানায়। তাছাড়া শিশুর ৭ মাস বয়স হলে, তারা শিশুটির জন্য অন্ন প্রাসন দিবস পালন করে। এদিন তারা মহা ধুমধামের সাথে সকল আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ায়। এ সময় যারা খেতে আসে তারা সোনা, রূপা, জামাকাপড়, টাকা দিয়ে বা নানা রকমভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে।

পূর্বে তাদের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে পোড়ানো হত। তবে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়ারও নিয়ম ছিল। কিন্তু বর্তমানে জায়গার অভাবে মৃত ব্যক্তিকে তারা পুড়িয়ে থাকে। মৃত্যুর দশ দিন পর তারা দশক কর্ম পালন করে। এদিন সকলকে মিষ্টি খাইয়ে শুদ্ধতার কার্য সম্পাদন করে। এগারো দিনের দিন তারা ব্রাহ্মণ দিয়ে শ্রাদ্ধকার্য (শুদ্ধতা আনয়ন) সম্পাদন করে ও সকলকে পানবিড়ি খাওয়ায়। বার দিনের দিন মাছ-মাংস খাওয়া নিষেধ। তের দিনের দিন তারা মৃত ব্যক্তির জন্য যজ্ঞ পালন করে। এদিন সামর্থ অনুযায়ী তারা গ্রামের সকল মানুষকে খাওয়ায় ও মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করে। মৃত্যুর এক বৎসর পর তারা একইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাকে।

উপসংহার

বর্তমানে রিশিল্পী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এ সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা রকম প্রকল্প গ্রহণ করায় তাদের মধ্যে অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অবশ্য রিশিল্পী খুব কম সংখ্যক কাওরা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কাওরা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, তবেই একদিন এ সকল নিঃস্ব মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব হবে।

কৃতজ্ঞতা : শতদল দাশ

বাংলাদেশে যাযাবর এবং ভ্রাম্যমান স্কুল

ভূমিকা

যাযাবর বলতে বুঝায়, যারা ঘুরে বেড়ায় বা যাদের কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। ইংরেজী Gypsy শব্দের বাংলা হল যাযাবর। উপ মহাদেশের মধ্যে ভারতে এদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে যাযাবর বলতে বুঝায় 'বেদে' সম্প্রদায়ের লোকদের। এদের আবাসভূমি বাংলাদেশ বা ভারত হলেও, এদের আদি উৎস মিশর বলে ধারণা করা হয়। তবে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এদের লক্ষ্য করা যায়।

ভ্রাম্যমান স্কুল

ভ্রাম্যমান শব্দের অর্থ যে সর্বদা অগ্রগামী বা যা দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তনশীল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পলিথিন কাগজের তৈরী ছোট ছোট ঘরে অথবা নৌকায় এক শ্রেণীর লোক কোন স্থানে কয়েকদিন অবস্থান ক'রে আবার অন্যত্র চলে যায়। সঙ্গত কারণেই, এ সকল পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এ সকল বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য যে শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয় তাকে বলা হয় ভ্রাম্যমান স্কুল।

শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাথমিক পর্যায় এদের মধ্যে গৃহস্থ পরিবার থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশের জন্য তারা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার পর যাযাবরদের মধ্যে মাতব্বর শ্রেণীর লোকদের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে কেউ কেউ কিছুটা লেখাপড়া জানত। পরবর্তী সময় এদের উপর লেখাপড়ার দায়িত্ব অর্পিত হলে তারা তা পালনে ব্যর্থ হয়। এক সময় শিক্ষকদের অবহেলার কারণে স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে কয়েকজন শিক্ষক কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করলে, পুনরায় স্কুলগুলো শুরু হয়। তখন থেকেই ভ্রাম্যমান স্কুলগুলোর পুনরায় পথ চলা।

স্থান পরিবর্তন

যেহেতু স্কুলগুলো ভাসমান, তাই এগুলো কখনও একটি স্থানে থাকে না। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে স্কুলগুলো স্থান পরিবর্তন করে। যেমন, ঢাকার তেঘড়িয়ায় দু'দিন পূর্বে একটি দল অবস্থান নিয়েছে, তাদের সঙ্গে একটি স্কুল রয়েছে। দেখা গেল, এক সপ্তাহ পর দলটি ঐ স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে গেল। তাই, সঙ্গত কারণেই স্কুলটিও তাদের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করবে।

বিগত দিনগুলো

বিগত দিনগুলোতে শিক্ষকদের সযোগিতা করার জন্য Helping teacher এবং Supervisor ব্যবস্থা ছিল যা বর্তমানেও রয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষক, Helping teacher এবং Supervisor জানেন যে, তারা ২৪ ঘণ্টাই শিক্ষক। তাই তাদের ব্যবহার, শিক্ষা, সহযোগিতা, একনিষ্ঠতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এটাই তাদের মূল লক্ষ্য।

বিগত দিনের কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ :

১। ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা
২। বয়স্ক শিক্ষা
৩। স্বাস্থ্য
৪। বাল্য-বিবাহ এবং বহুবিবাহ সম্পর্কে শিক্ষা
৫। নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া

যোগাযোগ রক্ষা

যেহেতু স্কুলগুলো কোন নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না, তাই যোগাযোগ রক্ষা করা খুব কষ্টকর। তবে যোগাযোগের ব্যাপারে প্রত্যেকের রয়েছে যথেষ্ট আন্তরিকতা। প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে শিক্ষক, Helping teacher এবং Supervisor একত্রিত

হয়ে প্রত্যেকের সহযোগিতায় ঐ মাসের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা হয়। ২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ৫ জন Helping teacher এবং ১ জন Supervisor ছিলেন, যারা সফলতার সাথে কাজ করে গিয়েছেন। এদের মধ্যে ৩ জন Helping teacher এবং ১ জন Supervisor খ্রীষ্টান কর্মী।

উপসংহার

এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পর, অনেক যাযাবর পিতা-মাতা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন যে, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন। এখন তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে শিখেছে এবং ধীরে ধীরে তাদের সমাজে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা : ইম্মানুয়েল সুধীর জয়ধর (ভ্রাম্যমান কাটেখিষ্ট)

সংখ্যালঘুদের অধিকার

(১) সংখ্যালঘুদের প্রথম অধিকারটি হচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার। প্রকাশ্য অথবা অপ্রত্যক্ষভবে গণহত্যার মতো, চরম অস্বীকৃতির মতো অনেকভাবেই এই অধিকারকে উপেক্ষা করা যায়। জীবনের প্রতি অধিকার অলংঘনীয়।

(২) সংখ্যালঘুদের নিজস্ব কৃষ্টি সংরক্ষণের এবং বিকাশের অধিকার।... এই অধিকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো রয়েছে আরও একটি অধিকার : একই কৃষ্টির এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অধিকারী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের অধিকার, হতে পারে সে জনগোষ্ঠী ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী।

(দ্র:, শান্তি স্থাপন করতে হলে সংখ্যালঘুদের শ্রদ্ধা করুন, ৫, ৬, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী, বিশ্ব শান্তি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পোপ দ্বিতীয় জন পলের বাণী)

বাংলাদেশ মণ্ডলীর নতুন পালকীয় সেবাকাজ

ভাসমান জনগণের পালকীয় যত্ন

গত ৬ মার্চ রোজ শনিবার বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনী কক্ষের এক হল রুমে শ্রদ্ধেয় ফাদার রেনেতো রস্‌স-এর উদ্যোগে 'ভাসমান জনগণের পালকীয় যত্ন' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ভাসমান জনগণ অথবা তাদের প্রতিনিধি এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত আলোচনা সভায় বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রদ্ধেয় তিনজন বিশপের উপস্থিতি আমাদের ইঙ্গিত প্রদান করে যে, সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন ভাসমান ভবঘুরে জনগণও মণ্ডলী নামক খোয়াড়ের মেষে পরিণত হবে।

বাংলাদেশের জোভেরিয়ান মিশনারী সম্প্রদায়ের নবীশদের পরিচালনায় আধা ঘন্টা ব্যাপী এক প্রার্থনানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রার্থনা শেষে ফাদার রেনেতো রস্‌স সভার কর্ম-পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন : বাংলাদেশে যে ভাসমান জনগোষ্ঠী রয়েছে, এদের জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সামগ্রিকভাবে কিছু করা যায় কি-না ? তিনি গোটা মানব জাতিকে ভাসমান বলে উল্লেখ করেন, কারণ এই পৃথিবীতে আমরা ক্ষণিকের অতিথি মাত্র। স্বর্গরাজ্য হল আমাদের আসল ঠিকানা। এখানে সার্বিক আলোচনায় এটা পরিষ্কার ছিল যে, ভাসমান লোকদের পালকীয় সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য তাদের ধর্মান্তরিত করা নয়, বরং তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে কেবলমাত্র সেবা দান করা।

ভাসমান জনগণের প্রতিনিধিদের আলোচনা পর্বে প্রথমে মাহালিদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মি: আব্রহাম হাঁসদা। তিনি বলেন : 'মাহালি একটি আদিবাসী সম্প্রদায়, যার আদি নিবাস ভারতের ডুমকা প্রদেশের ছোট নাগপুর অঞ্চলে। পেশাগত কারণে এরা আনুমানিক ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে আসে। মাহালীদের প্রধান কাজ বাঁশ থেকে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী তৈরী করা। পণ্যসামগ্রী তৈরীর কাঁচামাল যেখানে সহজলভ্য এবং তৈরী পণ্যসামগ্রী যেখানে সহজে বাজারজাত করা যায়, সেখানেই এরা বসতি স্থাপন করে। পেশাগত কারণে এরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। মাহালি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এখন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত। এখন বাঁশের কাজ চলে না বলে তারা নিজেদের পরম্পরা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কর্মসংস্থানের চেষ্টা চালাচ্ছে। পেশার পরিবর্তনের কারণে এখন অনেক মাহালি স্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তুলেছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সুইহারীর সাদামহল গ্রামে প্রথমবারের মতো মাহালীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়।'

রি-শিল্পী কর্মী শতদল দাশ কাওরাদের পক্ষে বলেন : 'যারা শুকরের পাল নিয়ে বছরের বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়, তাদের কাওরা বলে। সমাজের চোখে এরা অস্পৃশ্য, অর্থাৎ সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকেরা এদের স্পর্শ করে না, কারণ স্পর্শ করলে পাপ হয়। এরা এতই গরীব যে, নিজেদের শুকরের পাল না থাকায় অন্যের পাল নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। অনেক সময় পালের মালিক এই অসহায় কাওরাদের সাথে চুক্তি বা শর্তগুলো মানে না এবং ন্যায্য মজুরী থেকেও বঞ্চিত করে। কিন্তু তাদের প্রতিবাদের ভাষাও থাকে না। বিচ্ছিন্ন গ্রামে বাস করে বলে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার তেমন কোন সুযোগ পায় না। অপর দিকে, এদের জন্য কোন চিত্তবিনোদনের সুযোগ নেই বলে প্রতিনিয়ত যৌন আনন্দে মেতে থাকে আর সদস্য সংখ্যাও বেড়ে যায়। সদস্য সংখ্যা বেশী, আর উপার্জন কম বলে, দৈন্যতা এদের পিছু ছাড়ে না কখনও। বাল্য বিবাহ এদের প্রথম ও প্রধান সারির সমস্যা।'

ভ্রাম্যমান বেদে স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক মি: সুধীর জয়ধর বেদে সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে

বলেন : 'বেদেদের মোবাইল জনগণও বলা হয়, যার অর্থ দ্রুত স্থান পরিবর্তনশীল জাতি, অর্থাৎ যারা অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। বেদে সমাজের লোকেরা ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করে। এই ভ্রাম্যমান লোকগুলোর সঙ্গে থাকে একটি করে স্কুল, যে স্কুল পরিচালনা করেন ঐ দলের কোন স্বল্প শিক্ষিত যুবক বা বৃদ্ধ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে এখানে নৈতিকতা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কেও গভীর সচেতনতা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ করে নামাজ শিক্ষা ও কোরান শরিফ শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। মোট ১৮টি মোবাইল স্কুল এবং ২৮টি স্থায়ী স্কুল আছে এই বেদেদের মাঝে। আগে যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ভাল ছিল না, তবে এখন বেশ উন্নত হয়েছে। একবার সমাবেশে মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

মাহালী সম্প্রদায়ের ফাদার বার্ণাড টুডু বলেন : 'অধিকাংশ মাহালী যেহেতু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত, তাই মণ্ডলী নিজেই এদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে বেশ বাস্তবমুখী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। মণ্ডলীর পাশাপাশি ব্র্যাক, আশা পরিচালিত কয়েকটি স্কুল এখানে শিক্ষা বিস্তারে বেশ ভাল ভূমিকা রাখছে। মাহালী সম্প্রদায় থেকে অতি সম্প্রতি একটি মেয়ে কলেজে পড়াশুনা করছে, এ মেয়েটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পালকীয় যত্নের ক্ষেত্রে এখানে খ্রীষ্টযাগ অর্পণ করা হয়, তবে কোন নির্দিষ্ট গীর্জাঘর নেই বলে বেশ অসুবিধা হয়।'

ইতালিয়ান বংশজাত জেভেরিয়ান মিশনারী ফাদার রিকার্দো বলেন : 'ভাসমান জনগোষ্ঠীর সাথে আমরা জীবনের সংলাপ করতে পারি। সংলাপের অংশ হিসেবে আমরা এদের সাথে মিশব, খাওয়া-দাওয়া করব আর জীবন নিয়ে সহভাগিতা করব। টোকাইরাও হতে পারে নতুন এক ধরনের যাযাবর, যাদের নেই কোন আবাসস্থল। আমরা এই ভাসমান লোকদের কাছ থেকে শিখতে পারি কেমন করে অল্প জিনিস নিয়ে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা যায়। সচেতন থাকা আবশ্যক, যেন আমরা এই ভাসমান লোকদের ভাগ্য উন্নয়নের নামে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে না ফেলি।'

তেইজে সম্প্রদায়ের সদস্য ব্রাদার গিয়োম বলেন : 'ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, সমগ্র বেদে সম্প্রদায়ের আদি ধর্ম ছিল হিন্দু। এখন থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে রাজনৈতিক কারণে এরা মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। ময়মনসিংহে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা আগে নৌকায় বাস করতো। এখন অভাবের কারণে তারা নদীর কিনারে নৌকা আকৃতি তাবুর ঘর করে তারা নিজেদের আবাসস্থল নির্মাণ করে। এই সম্প্রদায়ে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা বেশী শক্তিশালী এবং কর্মঠ। শিল্প কারখানা নির্মাণের নামে সরকার এদের উৎখাত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা সংগঠিত ছিল বলে তেমন সফল হয়নি। এই আন্দোলনে নারীরা বেশী ভূমিকা রেখেছিলেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার প্রতি বেশী উৎসাহ নেই বলে, স্কুলে তাদের উপস্থিতি কম। তবে তাদের পিছনে সময় দিলে তারা বেশ উৎসাহ দেখায়, পরিবেশের কারণে তাদের এই উৎসাহ বেশী দিন স্থায়ী থাকে না। আগে নিজেদের ধর্ম ইসলামের রীতিনীতি বেশী পালন করত না। তবে মিশনারী স্কুলের সচেতনতার কারণে ধর্মকর্ম এবং বিধেয় বিধি পালনে বেশ আগ্রহ দেখা যায়।'

নিজের অভিজ্ঞতার কথা সহভাগিতা করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও বলেন : ' কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুকুরের পাড়ে ১০-১২টি মাহালি পরিবার বাস করত। একবার তিনি যখন তাদের পালকীয় সফরে গিয়ে দেখেন, প্রতিটি ঘর খোলা, তবে কোন ঘরে কোন লোক নেই। সারা গ্রাম ঘুরে তিনি মাত্র একটি কুকুর খুঁজে পান। মাহালি সম্প্রদায়ের এক লোক একবার বিশপের সাথে সহভাগিতা ক'রে বলেছিলেন, 'তিনি ১৭ বছর ধরে কাটেখিষ্টের কাজ করছেন, তবে মিশন থেকে কোন বেতন গ্রহণ করেন না। তিনি একজন কাটেখিষ্ট বলে সারা দিনের কাজ শেষ করে তিনি আসর বসান নিজের গ্রামে এবং সেখানে তিনি বাইবেলের কথা দিয়ে গান রচনা করে পরিবেশন করেন।' তিনি আরও বলেন, 'পুকুর থেকে তিনি প্রথমে কচুরীপানা তুলে আনেন, যাতে ফাদার তার জাল ভালভাবে ফেলতে পারেন।' বান্দরবানে অনেক ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোক আছে যারা বছরের বিশেষ এক সময়ে বিশেষ কারণে একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাত্রা করেন। চট্টগ্রাম শহরে কিছু মান্দী সম্প্রদায়ের লোক আছে, যাদের আদি নিবাস ময়মনসিংহে। এই মান্দী সমাজের লোকেরা চট্টগ্রামে যাযাবরদের মত জীবন যাপন করেন।'

শ্রদ্ধেয় বিশপ থিওটোনিয়াস তার বক্তব্যে বলেন : 'মাহালী সম্প্রদায়ের লোকেরা পেশাগত কারণে অতীতে চলমান ছিল, কিন্তু আজকে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। আগে বাজার ভিত্তিক ব্যবসা ছিল বলে এক সময় তারা বাজার এবং কাঁচামালের জন্য ঘুরে বেড়াত। আজ বিকল্প কাজ পেয়েছে বলে এরা স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেছে। কতিপয় কয়েকটি গোত্র আছে যারা গোত্রবদ্ধভাবে চলমান; যেমন বেদে বা কাওরা। আবার এমন গোত্রও আছে যারা গোত্রবদ্ধভাবে নয় বরং বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তি বা দল হিসেবে চলমান।'

শ্রদ্ধেয় বিশপ মাইকেল তার বক্তব্যের শুরুতে ফাদার রেনেতোকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন : 'বাংলাদেশ মণ্ডলীতে প্রথমবারের মতো ফাদার রেনেতো বেদেদের সাথে পালকীয় কাজ শুরু করেন। তার হাত ধরে এখন অনেকে এই কাজের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করছে। এক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাব করে বলেন যে, শুরু থেকে এই পর্যন্ত বেদেদের জন্য যা-কিছু করা হয়েছে তার একটি লিখিত অনুলিপি বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীতে প্রদান করা হলে, বাংলাদেশ মণ্ডলীর কাছে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে এবং স্থায়ীভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে আরো সহজ হবে।'

ফাদার রেনেতো ভাসমান এ সকল লোকদের পালকীয় যত্নসেবার জন্য বাস্তব প্রস্তাব রাখার আহ্বান জানালে, উপস্থিত সকলে স্বত:স্ফূর্তভাবে বিভিন্ন প্রস্তাব রাখেন। এখানে কয়েকটি বাস্তবমুখী প্রস্তাবের একটি তালিকা দেওয়া হল :

১। সার্বিকভাবে একটি সম্মেলন, যেখানে প্রত্যেক ভাসমান জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সদস্য-সদস্যা অংশগ্রহণ করবেন।

২। ক্রেডিট প্রোগ্রাম চালু করা, যার মাঝে তারা নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে পারবেন।

৩। মেয়েদের জন্য হাতের কাজ, এবং সময়ের সাথে তাল রেখে কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ।

৪। দেশীয় ফাদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বেচ্ছায় দেশীয় ফাদারদের এই কাজে আগ্রহ দেখানো।

৫। ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য কোন নতুন কমিশন ঘোষণা বা কমিশনের অংশীদারিত্ব দান করা।

৬। ছেলেমেয়েদের হোস্টেলে রেখে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

৭। এই ভাসমান জনগোষ্ঠীর ভাষা আগে শিখতে হবে এবং এই ভাষাতেই ওদের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

৮। সচেতনতা আনতে হবে, যেন এই ভাসমান জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস না করে ফেলি।

৯। এই ভাসমান জনগোষ্ঠীকে কোন না কোন ধর্মপল্লীর আওতায় আনতে পারলে, পালকীয় যত্ন দেওয়া আরও সহজ হবে।

১০। কাজ করতে হলে প্রথমে নিজেকে ভাসমান বলে মনে করতে হবে। নিজেকে বড় মনে করলে তাদের উন্নত করতে পারব না, বরং সব ধ্বংস করে ফেলব। নিজেকে ওদের স্তরে নামাতে হবে।

১১। এদের নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর ইতিহাস নিয়ে যদি খ্রীষ্টমণ্ডলীতে আসে, তবে আমাদের মণ্ডলী আরও সমৃদ্ধশালী হবে বলে আশা করা যায়।

সবশেষে, ফাদার রেনেতো উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ এবং কাজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কৃতজ্ঞতা : মিল্টন খোকন হালদার

এশিয়া মহাদেশে যীশুর কাহিনী বলা

প্রথম এশীয় মিশন সম্মেলনের বাণী

চিয়াং মাঈ, থাইল্যাণ্ড, অক্টোবর ১৮-২২, ২০০৬ খ্রী:

যীশু জীবিত আছেন ! খ্রীষ্ট পুনরুত্থান করেছেন ! আমাদের মুক্তিদাতা আমাদের মাঝেই আছেন; তাঁর জীবন সে তো আমাদেরই জীবন। এ বিশ্বাস ঘোষণাগুলো ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দের এশীয় মিশন সম্মেলনের অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমাদের অনুভূতি জয় করেছিল। আমরা ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮-২২ অক্টোবর থাইল্যাণ্ডে সম্মিলিত হয়ে একই আনন্দঘন বিশ্বাস ঘোষণ করেছি, যে বিশ্বাস খ্রীষ্টের প্রথম শিষ্যগণও ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন : "আমি প্রভুকে দেখেছি" (যোহন ২০:১৮); "উনি প্রভু" (যোহন ২১:৭); "কথাটা সত্য ! প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন" (লুক ২৪:৩৪); "প্রভু আমার ! ঈশ্বর আমার" (যোহন ২০:২৮) ! প্রথম শিষ্যগণ আনন্দ করেছিলেন : তাঁদের বন্ধু, তাঁদের গুরু, তাঁদের প্রবক্তা, তাঁদের দরদী আরোগ্যদাতা, তাঁদের প্রাণপ্রিয় অলৌকিকভাবে – রহস্যময়ভাবে – জীবিত আছেন। ভয় ও হতাশা, আঘাত ও ভাঙ্গন বিশ্বাস ও আনন্দে পরিণত হয়েছে। এমনটি কেই-বা আশা করেছিল ? এমনটি কেই-বা স্বপ্ন দেখেছিল ?

যীশু তাঁর অনুসারীদের নিকট সশরীরে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি তাঁদের নাম ধরে ডেকেছেন, যেমন মা ালার মেরী, থমাস, পিতর, যাকোব, যোহন। তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি শান্তি ও পুনর্মিলনের কথা বলেছেন। ঘটে গিয়েছিল অবিশ্বাসী শিষ্যদের হৃদয়ের পরিবর্তন। তথাপি, ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যীশু তাঁদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁদের চ্যালেঞ্জও জানিয়েছেন। তিনি বাণীপ্রচার কাজে তাঁদের প্রেরণ করেছেন এ বলে : "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" (মার্ক ১৬:১৫); "তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর" (মথি ২৮:১৯); "তোমরাই এই সব-কিছুর সাক্ষী রইলে" (লুক ২৪:৪৮); "পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত করে তোমাদের পাঠাচ্ছি" (যোহন ২০:২১)। আর তাই শিষ্যগণ যীশু-গল্প বলার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা দূরে-কাছে সর্বত্রই গিয়েছিলেন, যেমন যাকোব গিয়েছিলেন জেরুসালেমে, পিতর ও পল গিয়েছিলেন রোমে, থমাস গিয়েছিলেন ভারতে। আসলে, প্রভুর সাক্ষাৎ মানে বাণীপ্রচার কাজে প্রেরিত হওয়া।

ঈশ্বরের দয়াময় ইচ্ছায়, যীশুর সমকালীন শিষ্য হিসেবে আমরা ১০০০ জনের বেশী অংশগ্রহণকারীবৃন্দ প্রথমবারের মত পথ চলতে শুরু করা এশীয় মিশন সম্মেলন উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছিলাম। উত্তর থাইল্যাণ্ডের চিয়াংমাঈয়ের একটি সুপরিসর হোটেল পরিণত হয়েছিল নতুন 'উপর তোলার' ঘরে। আমরা সমবেত হয়েছিলাম আমাদের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করার জন্য, আমাদের

কাহিনী শোনানোর জন্য, এবং লেবানন থেকে জাপান, কাজাকিস্তান ও মঙ্গোলিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া বিশাল এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। আমরা শুনেছি প্রেরণাসঞ্চারী গল্প, এগুলো সংখ্যায় এত যে, গুণে শেষ করা যায় না, শুনেছি জীবন, বিশ্বাস, বীরত্ব, সেবা, প্রার্থনা, সংলাপ, ও বাণীঘোষণার গল্প। ঈশ্বরের বন্ধুত্বপূর্ণ আত্মিক শক্তির সক্রিয় উপস্থিতি নিয়ে কারোর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। যীশুর শিষ্যদের মত, আমরা একসাথে মিলে সহভাগিতা, শ্রবণ, প্রার্থনা, খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস ও জীবন উদ্‌যাপন করেছি। সংস্কৃতি ও ভাষার বিচিত্রতা আমাদের এক অভিন্ন বিশ্বাস উদ্‌যাপনে আলো ও রঙের এক নতুনমাত্রা যোগ করেছিল।

এই পালকীয়-ধর্মীয় সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসে এক অনন্য বাণীপ্রচার পদ্ধতি : গল্প-বলা বা বিশ্বাস-সহভাগিতা। আমরা বয়স্ক, পরিবার, যুব, শিশু ও নারী, মৌলিক মাণ্ডলিক সমাজগুলো সম্পর্কে নানা রকম বৃত্তান্ত শুনেছি। আমরা শ্রবণ করেছি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও আদিবাসী ধর্মের ধ্যান-ধারণাগুলো। সমকালীন বিষয়েরও উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন ভোগবাদ, গণমাধ্যম, অভিবাসী, ও আন্তধর্মীয় সংলাপ। জাতিগত দ্বন্দ্ব ও ধর্মীয় টানাপোড়েনের বর্তমান বাস্তবতায় বাণীপ্রচার প্রেরণকাজে এগুলো কতই না গুরুত্বপূর্ণ !

যীশুর কাহিনী একটি অনন্য সূতার মত, যা এ সকল জীবন অভিজ্ঞতাকে একটি চমৎকার পূর্ণাঙ্গ কাহিনীতে গাঁথে। এশীয় জনগণের সকল বর্ণ, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্ম ও শিল্প যেন একটি চমৎকার নকশি-কাঁথা। প্রভু, তোমার উপায়গুলো কতই না অপরূপ ! তোমার পরিকল্পনাগুলো কতই না গভীর !

জগতটা গল্পে পরিপূর্ণ। গল্প ছাড়া মানব জীবন অকল্পনীয়। গল্পগুলো আমাদের বলে আমরা কে বা কারা আর এগুলো এশিয়ার, এমনকি জগতের সকল মানুষের সঙ্গে আমদের যুক্ত করে। এগুলোর মাধ্যমেই আমরা আমাদের জীবনের গভীরতর বৈশিষ্ট্যগুলো এবং আমাদের নিজ সত্তার রহস্য সম্পর্কে জানতে পারি। গল্প আমাদের জীবন ও আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে সুগভীর প্রভাব ফেলে। এগুলো দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে পরিবর্তন আনে। এগুলো সমাজ গঠন করে। গল্পের থাকে একটি গোপন গতিশীলতা ও রূপান্তরশীল ক্ষমতা, বিশেষ করে যখন এগুলো অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এ গল্পগুলো এমনকি স্কুলে বা বই পড়ে শিখা পাঠগুলোর চেয়ে অনেক কাল পর্যন্ত স্মরণে থাকে।

যীশু পরিচিত ছিলেন একজন গল্প-বলিয়ে হিসেবে। একজন রাব্বি, অর্থাৎ ধর্মগুরু হিসেবে, তাঁর শিক্ষাদানের প্রিয় পদ্ধতি ছিল উপমা, ঐশরাজ্যের গভীরতা নির্দেশক জ্ঞানগর্ভ চিত্র বা নিদর্শনকর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া। দয়ালু সামারীয় বা অপব্যয়ী পুত্রের উপমা-কাহিনী কারই-বা জানা নেই ? ঈশ্বরের সঙ্গে এবং আমাদের সকল ভাইবোনদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে ঘিরে যীশুর বলা উপমাগুলো নতুন নতুন সম্ভাবনার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানায়। অনেকেই এশীয়ায় জন্মগ্রহণকারী যীশুকে এ মহাদেশের মহান শিক্ষাগুরুদের নেহায়েত একজন মনে করেন, যেমন কনফুসিয়াস, লাও তু, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ। তবে অনেক বিস্ময়করভাবে, আমরা যারা খ্রীষ্টান আমরা বিশ্বাস করি, যীশু হচ্ছেন ঈশ্বর যিনি পিতা কর্তৃক প্রেরিত, তিনি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরের দেহসম্পন্ন প্রেমের গল্প – ঈশ্বরের দেহধারী পরম কাহিনী।

এশীয় মিশন সম্মেলনে পোপ দ্বিতীয় জন পলের 'এশিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলী' শীর্ষক প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্রে বর্ণিত অনেকগুলি চ্যালেঞ্জের উপর আলোকপাতে চেষ্টা করা হয়েছে। "ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি যা এশিয়ার কৃষ্টিসমূহের স্বগোত্রীয় তা প্রাধান্য দিতে হবে। মঙ্গলসমাচারে যেমন তেমনি যীশু খ্রীষ্টের কাহিনী পর্যালোচনা, বাণী ঘোষণায় আর বেশী ফলপ্রসূভাবে করা সম্ভব" (এশিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলী, ২০চ)। পোপ দ্বিতীয় জন পল প্রস্তাব করেছেন যে, "স্মৃতিতে অম্লান থাকে এমন একটা পদ্ধতিতে গল্প, উপমা এবং প্রতীক যা এশিয়ার শিক্ষা পদ্ধতিতে বেশী উল্লেখযোগ্য তা অনুসরণ করা উচিত" (এশিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলী, ২০ছ)।

এশিয়ার স্থানীয় মণ্ডলীগুলো কথা ও কার্যকর সেবাকাজ উভয়ভাবে যীশুর কাহিনী বারংবার বলার মাধ্যমে খ্রীষ্টের প্রৈরিতিক আদেশে বিশ্বস্ত থাকতে পারে। মণ্ডলী যীশুকে ঘিরে তার নিজ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাসই বার বার ঘোষণা করে। মহান গল্পকার পবিত্র আত্মা সব রকম পরিস্থিতিতে মণ্ডলীকে পরিচালনা দান করেন এ কথা ঘোষণা করার জন্য, বিশেষ করে একটি রূপান্তরিত

জীবনের সাক্ষ্যের মাধ্যমে : "আমরা যা শুনেছি, নিজেদের চোখেই যা দেখেছি, দু'চোখ ভরেই দেখেছি, আমাদের হাত যা স্পর্শ করেছে" সেই তা "জীবনস্বরূপ স্বয়ং বাণী" আর তা ছাড়া কিছুই নয় (দ্র: ১ যোহন ১:১)। মিশন অর্থ যীশুর কাহিনী সক্রিয়-সপ্রাণ রাখা, খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন করা, দয়া প্রদর্শন করা, অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা, ক্রুশ বহন করা, জীবন্ত ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া।

এম্মাউসের পথে শিষ্য দু'জন বলেছিলেন : "পথে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ও শাস্ত্রের অর্থ অমন বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের মনের ভেতরে কি একটা আগুন জ্বলছিল না ?" (লুক ২৪:৩২)। আমাদের জন্য চিয়াং মাঈয়ের পথ ছিল এম্মাউসের পথ। মিশন সম্মেলনে আমরা সহভাগিতা করেছি আমাদের বিশ্বাস অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশ ও হংকং, থাইল্যাণ্ড ও চীন, জাপান ও নেপাল অর্থাৎ সমগ্র এশিয়া মহাদেশের গল্পগুলো আমাদের মনের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আগুন। "এশিয়ার মণ্ডলী" প্রেরণাপত্রের এ কথাগুলোজোরে জোরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল : "আগুন সেই সব কিছুই জ্বালাতে পারে যা শুধুমাত্র আগুনের মধ্যে রয়েছে" (এশিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলী, ২৩খ)। এশিয়ার মণ্ডলীকে হয়ে উঠতে হবে একটি "প্রজ্জ্বলিত সমাজ যার মধ্যে রয়েছে যীশুকে জানার জন্য, ভালবাসার জন্য ও অণুসরণ করার জন্য প্রৈরিতিক উদ্যম" (এশিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলী, ১৯ক)। যীশু চেয়েছেন, পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিতে, যেন এই আগুন জ্বলতেই থাকে। "এশিয়ায় মণ্ডলী তার উদ্যম সহভাগিতা করে যেন এই অগ্নি এখন পুনঃপ্রজ্জ্বলিত হয়" (এশিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলী, ১৮গ)। আমরা জানি, এশীয় বিশপগণের যৌথ সম্মিলনী (FABC) এবং এর বাণীপ্রচার কার্যালয় আয়োজিত এই ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দের এই মিশন সম্মেলন, পবিত্র আত্মার অপার করুণায়, অনেকের হৃদয় প্রজ্জ্বলন করতে সক্ষম হয়েছে।

এশীয় মিশন সম্মেলন, বিশেষ করে আমাদের বিশ্বাসের গল্পগুলির সহভাগিতা, এশিয়ার জনগণের সঙ্গে (বিশেষ করে দরিদ্রদের সঙ্গে), ধর্মগুলোর সঙ্গে এবং সংস্কৃতিগুলোর সঙ্গে সংলাপের আমাদের যে বিশেষ দায়িত্ব তার জন্য নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবস্থা করেছে (দ্র: এইঈউ ৪:৩.১.২)। আজকে এশিয়ার দরিদ্রদের (ভিক্ষুক, এইডসে আক্রান্ত, অভিবাসী, সমাজচ্যুত প্রভৃতিদের) গল্পগুলি অবশ্যই যীশু-গল্প ও তাঁর নিস্তার রহস্যের প্রেক্ষাপটের মধ্যেই পাঠ করতে হবে। এশিয়ার অনেক শ্রদ্ধেয় ধর্মকে এ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে যে, এগুলো সকল জাতির মানুষকে নানা রহস্যসময় উপায়ে ঈশ্বরের দিকে চালিত করার ঐশ্বরিক সার্বজনীন পরিকল্পনার মধ্যেই রয়েছে। এশিয়ার সংস্কৃতিগুলোর বিচিত্রতা যীশুর কাহিনী সহভাগিতা করার ক্ষেত্রে সচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে। এ সহভাগিতার "এশিয়ায় আজকের বহু জাতি, বহু ধর্মীয় ও বহু কৃষ্টিগত অবস্থানে... একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে" (এশিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলী, ২১খ)। তিন দশকের বেশী সময় ধরে FABC-এর পৃষ্ঠপোষকতায় চলে আসা "ত্রিমুখী সংলাপ" "নতুন ও বিস্ময়কর উপায়ে" (এশিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলী ২০চ) সম্পাদন করা যেতে পারে – এ রকমই একটি উপায় হল, আমাদের জীবন-গল্প সহভাগিতার মাধ্যমে দান বা অনুগ্রহের বিনিময়।

এই প্রথমবারের মত আয়োজিত এশীয় মিশন সম্মেলনে, আমরা পুনরাবিষ্কার করেছি "খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচারের আনন্দ", পোপ ষষ্ঠ পলের এ কথাগুলো সত্য হয়ে বাজে; ফলপ্রসু প্রচারকার্য "বর্ধমান ভালবাসা, নিষ্ঠা ও আনন্দের সঙ্গে" (খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচার, ১) সম্পাদিত হতে হবে। "প্রভুর করুণায় যে শুভসংবাদ মানুষ জানতে পেরেছে তা সানন্দে ঘোষণা করা" (খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচার, ৮০) যীশুর শিষ্যগণের কাজ।

সম্মেলনে আমরা অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিজেদের আমরা যীশুর গল্পের নতুন নতুন শিক্ষা, বিশেষ করে এ গল্পের এশীয় দিকগুলো, স্বদেশে আমাদের নিজ সমাজগুলিতে বয়ে আনার কাজে উৎসর্গ করেছি। আমরা চেষ্টা করেছি প্রজ্জ্বলিত থাকার, আমরা চেষ্টা করেছি যেন আমরা প্রাণবন্ত ও অনুপ্রেরণাধর্মী গল্পগুলো স্বদেশে বহন করে নিয়ে যেতে পারি সে লক্ষ্যে প্রস্তুত হওয়ার, যে গল্পগুলো তরুণদের অন্তরে বাণীপ্রচারের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেবে। অপদূতগ্রস্ত লোকটিকে বলা যীশুর এ কথাগুলো আমরা অনুসরণ করতে চাই (একটি শাস্ত্রাংশ যা আমরা সম্মেলনে বেছে নিয়েছিলাম) : "তুমি বরং বাড়িতে আত্মীয়দের কাছেই ফিরে যাও; তোমার জন্যে

প্রভু যা-কিছু করেছেন, তোমার প্রতি তিনি কত কৃপা দেখিয়েছেন, সেই কথা তুমি তাদের জানাও" (মার্ক ৫:১৯)।

আমরা গল্প, উপমা ও প্রতীকচিহ্নের মাধ্যমে একটি এশীয় পদ্ধতিতে, একটি স্মৃতি-জাগানিয়া উপায়ে বাণীপ্রচারের সমাগম হওয়ার চেষ্টা করেছি, এটা এমনই এক পদ্ধতি যা এশীয় শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যেমনটি পোপ দ্বিতীয় জন পল অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটা হচ্ছে অন্যদের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস সহভাগিতার একটি উপায়, সংলাপের একটি সত্যিকার পথ। তথাপি, আমরা যারা বাণীপ্রচারের এই বিশেষ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, "আমরা ভীত, শঙ্কিত হব না যখন ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে স্পষ্ট ভাষায় মুক্তিদাতা বলে ঘোষণা করার এবং মানব অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তরদানে আমাদের জন্য দরজাটি খুলে দেবেন" (FABC 5:4.3)।

এই বিশ্ব প্রেরণ রবিবারে, আমরা ফসলের মালিক প্রভুকে যুগে যুগে এশীয়ায় সেবাকাজের লক্ষ্যে আসা অসংখ্য প্রেরণকর্মীদের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমরা প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে প্রভুর প্রেম ও রক্ষায় ন্যস্ত করেছি আমাদের এশিয়ার হাজার হাজার প্রেরণকর্মীদের যারা আজকে পৃথিবীর প্রান্তে সেবা দিয়ে আসছেন।

আমাদের জননী এবং খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচারের তারা মারীয়ার নিকট আমরা সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছি আমাদের হয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য, যেন আমাদের হৃদয়-মন তাঁর পুত্র যীশুর প্রেমেতে বহ্নিমান থাকে, যাঁর গল্প আমরা আমাদের কথা ও কাজ এবং আমাদের জীবন সাক্ষ্যের মাধ্যমে বারংবার বলে যাব।

মিশন দিকনির্দেশনাসমূহ

প্রথম এশীয় মিশন সম্মেলনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, আমরা অংশগ্রহণকারীবৃন্দ ভাবনার এ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছি; এগুলিকে আমরা এশিয়ায় আমাদের সেবাকাজের জন্য অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছি, আর এগুলোর বাস্তবায়নে নিজেদের আমরা উৎসর্গ করেছি।

আমাদের জীবনে যীশুর কাহিনী

পুনরুত্থিত প্রভুর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সাক্ষাতের ভিত্তিতে আমরা যীশু-গল্পকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলব এগুলির মাধ্যমে :

– ঐশবাণীর গভীর অধ্যয়ন এবং এ বাণী অনুসারে জীবনযাপন এমনভাবে করা যেন তা যীশু-গল্পের ক্ষমতা আমাদের জীবনের রূপান্তর ঘটাতে পারে।

– একজনের ব্যক্তিগত জীবনে, আমাদের সকল অভিজ্ঞতাসমূহে, বিশেষ করে, আমাদের সংগ্রামে ও কষ্টে, আনন্দে ও দুঃখে যীশু-গল্পকে স্বীকার করে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

– খ্রীষ্টীয় সমাজের বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানকে, বিশেষ করে খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠানকে, প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের বলিষ্ঠ মুহূর্ত করে তোলা, যখন যীশু-গল্প আনুষ্ঠানিক উপাসনায় ব্যবহৃত চিহ্নসমূহের মাধ্যমে (যেমন রুটি-ছেঁড়া, ইত্যাদি) প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

– এশিয়ার জনগণের মধ্যে, বিশেষ যারা কষ্টে রয়েছে – যেমন দরিদ্র, প্রান্তিকশ্রেণী, অভিবাসী শ্রমিক, অসুস্থ, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে – তাদের মধ্যে ঐশ-রহস্য কাজ শুরু করার আগে বিনম্রতা ও সহৃদয়তার মনোভাব ও মূল্যবোধগুলো গড়ে তোলা।

– ভক্তসাধারণের, বিশেষ করে এশীয় মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ কর্ণধার হিসেবে যুবসমাজের, অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

– বিশেষ করে, আমাদের প্রেরণকার্য পরিচিতির বিশেষ চিহ্ন হিসেবে পরিচিত সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে, এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবিত দেশীয় ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে, যীশুকে ঘোষণা করা।

– এশিয়ার অন্যান্য মানুষের সঙ্গে জীবন-সংলাপের আধ্যাত্মিকতা নিত্য সঞ্জীবিত রাখা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা।

– মানসিক আঘাত, বিচ্ছিন্নতা, দুঃখ-কষ্ট, দরিদ্রতার গল্পে, আর তাদের অন্যান্য বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতায় যীশুর উপস্থিতি অনুধাবন করতে শেখা।

– জীবনের পূর্ণতার লক্ষ্যে ঐশদান হিসেবে যীশু-গল্প সহভাগিতা করার জন্য সুবর্ণ সময়ের সাগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকার কৌশল রপ্ত করা।

অন্যান্য ধর্মের মানুষের মধ্যে যীশু-গল্প

আমরা :

– অন্যান্য ধর্মের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের পরিচয়সাধনের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ক'রে আমাদের অজ্ঞতা ও বদ্ধ ধারণা স্বীকার করে নেব।

– আমাদের শিক্ষা ও গঠন প্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষ করে আমাদের যাজকীয়-গঠনগৃহগুলিতে, পারস্পরিক বুঝাপাড়ার সত্যিকার ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলব।

– অন্যান্য ধর্মে সক্রিয় ঐশরহস্যের প্রতি উন্মুক্ততায় ও বিনম্র মনোভাবে বেড়ে ওঠার লক্ষ্যে, বিশেষ করে মৌলিক মাণ্ডলিক সমাজগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততায়, পরিবার গঠন করব।

– অন্যান্য ধর্মের মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুশীলন সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝি ও বদ্ধ-ধারণার অবসানে অনুরূপ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করব।

– মিশ্র-বিবাহ এবং অন্যান্য আন্ত:ধর্মীয় পরিস্থিতির মধ্যে থাকা মানুষদের প্রতি আরও কার্যকর পালকীয় সেবা বাড়িয়ে দেব।

এশিয়ার বিচিত্র সংস্কৃতিতে যীশু-গল্প

আমরা :

– 'এশিয়ার খ্রীষ্টমণ্ডলী' প্রেরণাপত্রে বর্ণিত ইতিবাচক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলোকে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে, আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবনযাপনে অন্তর্ভুক্ত করে নেব, এটা অনেক বেশী প্রয়োজন যখন গণ-মাধ্যম ও বাজারের সহায়তায় ভোগবাদ, বস্তুবাদ এবং আরও অনেক দিক এ ধরনের মূল্যবোধগুলোর অবক্ষয় ঘটাচ্ছে।

– সেবা, দয়া, সুশৃঙ্খল জীবন, মনন, নীরবতা, সরলতা, পুনর্মিলন ও সম্প্রীতির একটি সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাব।

– স্থানীয় পালা-পার্বণ এবং নাচ ও গান, শিল্প ও স্থাপত্যের ন্যায় প্রকাশের সাংস্কৃতিক ধরনগুলোর সমন্বিতকরণে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

– সঠিক ধর্মশিক্ষার সাহায্যে সংস্কৃত্যায়নকে আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে পরিচয় করিয়ে দেব, যেন আমরা অনেক ফলপ্রসূভাবে যীশুর এশীয় মুখমণ্ডল আমাদের এশীয় ভাইবোনদের নিকট তুলে ধরতে পারি।

– মৌলিক মাণ্ডলিক সমাজগুলোকে (BECs) বাণীপ্রচার, সংস্কৃত্যায়ন ও আন্ত:ধর্মীয় সংলাপের একটি কার্যকর মাধ্যম করে তুলব।

অনুবর্তন কার্যক্রম

প্রতিটি ধর্মপাল সম্মিলনীর নিকট আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন যেন এগুলো জাতীয়, আঞ্চলিক পর্যায়ে মিশন সম্মেলনের আয়োজন এমনভাবে করে যার ফলে এশীয় উপায়ে এশীয় জনগণকে যীশু-গল্প বলার একটি নবায়িত মিশনবোধ কার্যকরভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে, আমাদের আবেদন FABC এর নিকট যেন এটা নিয়মিতভাবে অনুরূপ সম্মেলনের আয়োজন করে। আমাদের আশা, অন্যান্য কিছুর মধ্যে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো আমাদের মিশনারী গতিশীলতার পাশপাশি একটি তাগিদ বোধ এবং উৎসাহ ও আনন্দের একটি মনোভাবকে পুনঃজাগরিত করবে। কেননা তিনি সত্যি-সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন আর এশিয়ায় সক্রিয়-সপ্রাণ আছেন।

সূত্র : *Asian Mission Congress 2006*